শরী‘আতের আলোকে

জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

মূল : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

Contents

শরী‘আতের আলোকে
জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

মূল (আরবী) : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

শরী‘আতের আলোকে জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৯০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

مشروعية العمل الجماعى

تأليف: عبد الرحمن بن عبد الخالق

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল
জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪০ হি.
ফাল্গুন ১৪২৫ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Shariater Aloke Jamatbaddho Prochesta by **Abdur Rahman bin Abdul Khaleque**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0471-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	৪
লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৭
ভূমিকা	৯
জামা‘আত-এর অর্থ	১১
শরী‘আতের আলোকে জামা‘আত গঠন এবং জামা‘আতবদ্ধ হওয়ার বিধান	১৪
শাসক বা নেতার দায়িত্ব	২০
ফরযে কিফায়া সংক্রান্ত আল্লাহ্র আহ্বানে উম্মাহ্র সকল সদস্যই শামিল	২৪
স্থান-কাল ভেদে বিধি-বিধানের পরিবর্তন	২৮
ইসলামী বিশ্বে সংগঠন ও দলের উপকারিতা	৩৩
দাওয়াতী সংগঠন সমূহকে হারাম বলে ফৎওয়া দেওয়ার প্রকৃত কারণ	৩৬
(ক) দ্বীন প্রচারে অতি আগ্রহ	৩৮
(খ) জামা‘আত গঠনের রীতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না বলে ধারণা করা	৩৯
(গ) জামা‘আতে খাছ্ছাহ ও জামা‘আতে ‘আম্মাহ-এর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা	৪১
(ঘ) কিছু দলের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড	৪৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (জন্ম : ১৯৩৯ খৃ.) রচিত مشروعية العمل الجماعى-এর বঙ্গানুবাদ 'শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা' পুস্তিকাটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ ধারাবাহিকভাবে ৩ কিস্তিতে (ডিসেম্বর'১৮-ফেব্রুয়ারী'১৯) পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান এ পুস্তিকাটিতে সম্মানিত লেখক জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন তথা সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি সাবলীলভাবে দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করেছেন।

ভূমিকা বাদে এতে মোট ৭টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় সম্মানিত লেখক জামা'আত বা সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। জামা'আত বা সংগঠনের একজন আমীর থাকার স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টিও তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। ২য় অধ্যায়ে শরী'আতের আলোকে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, ৩য় অধ্যায়ে শাসক বা নেতার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ৪র্থ অধ্যায়ে ফরযে কিফায়াহ সম্পাদনে শাসক ও জনগণ উভয়ের দায়বদ্ধতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শারঈ বিধান প্রয়োগবিধির কথা আলোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী বিশ্বে দাওয়াতী সংস্থা ও সংগঠন সমূহের অবদান আলোচিত হয়েছে। এতে বর্তমানে মানুষের কাছে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত প্রচারে ও মুসলিম নবজাগরণে ইসলামী সংগঠন সমূহের অবদান যে অনস্বীকার্য তা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে সংগঠন করা হারাম মর্মে ফৎওয়া প্রদানকারীদের ভ্রান্তি ও কূপমণ্ডুকতা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এধরনের ফৎওয়া প্রদানের কারণ সমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটির শেষ দু'টি অধ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন জনতা একটি বিশেষ লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হ'লেই তাকে 'জামা'আত' বলে। জামা'আত গঠনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। মসজিদ ভর্তি মুছল্লী থাকলেও যদি ইমাম না থাকে, তাকে

যেমন জামা‘আত বলা হয় না। তেমনি মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও ‘ইমাম’ বলা হয় না। সেকারণ তিনজনে একটি সফরে বের হ’লেও সেখানে একজনকে ‘আমীর’ নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামা‘আতে ছালাত হ’ল জামা‘আতবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের অংশ। জামা‘আত চলা অবস্থায় ইমামের আনুগত্য না করলে যেমন মুক্তাদীর ছালাত কবুল হয় না, জামা‘আতবদ্ধ জীবনে আমীরের আনুগত্য না করলে হাদীছের ভাষায় তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু তথা বিশৃংখলিত অবস্থায় মৃত্যু। জামা‘আতবদ্ধ জীবন মানুষের স্বভাব ধর্মের অংশ। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়। মোটকথা আমীর মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমীর ব্যতীত সঠিক ইসলামী সমাজ কায়েম হওয়া অকল্পনীয়। যে জামা‘আত বা জনগোষ্ঠীর আমীর নেই সেই জামা‘আতের উদাহরণ হ’ল ঐ লাশের মতো যার মাথা নেই। মাথা ছাড়া দেহ যেমন অচল, আমীর বিহীন জামা‘আতও তেমনি অকার্যকর।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ’লে মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাক বা না থাক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সর্বাবস্থায় জামা‘আত ও ‘আমীর’ থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ‘তোমাদের উপর জামা‘আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ’ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ’ল’ *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হ’ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ’ল আযাব’ *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*।

অথচ বর্তমানে কিছু ব্যক্তি সংগঠন করা হারাম মর্মে ফৎওয়া দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এ ধরনের ফৎওয়া প্রদান নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও ঝুঁকি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার মানসিকতা বৈ কিছুই নয়। অথচ ভীরু ও কাপুরুষকে দিয়ে কখনো দ্বীন কায়েম হয় না। তারা আরো যুক্তি দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সংগঠন ছিল না। অতএব তা বিদ‘আত। এরূপ ধারণা কূপমণ্ডুকতা ছাড়া কিছুই নয়। এ জাতীয় ফৎওয়া উদ্ভাবনের কারণ সমূহের মধ্যে একটি হ’ল জামা‘আতে ‘আম্মাহ ও জামা‘আতে খাছ্ছাহ-এর মধ্যে পার্থক্য না করা। মূলতঃ জামা‘আত দুই প্রকার। ১. ‘জামা‘আতে আম্মাহ’ বা ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন এই পর্যায়ে পড়ে। এই সংগঠনের আমীর হবেন আমীরুল মুমিনীন, যিনি ইসলামী বিধান মতে

প্রজাপালন করবেন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন। এই ইমারতকে 'ইমারতে মুলকী' বা রাষ্ট্রীয় ইমারত বলা হয়ে থাকে। অমুসলিম দেশে এই 'ইমারত' কায়েম করা প্রায় অসম্ভব। ২. 'জামা'আতে খাছ্ছাহ্' বা বিশেষ সংগঠন। দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং দ্বীনদারদেরকে সংগঠিত করার জন্য কোন স্থানে তিনজন মুমিন থাকলেও তাদেরকে নিয়ে এই ধরনের জামা'আত গঠন করা অপরিহার্য। এই জামা'আত যত বড় হয়, তত ভাল। রাষ্ট্রের পক্ষে খুছূছী দাওয়াত প্রায় অসম্ভব। এর পরেও বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে অনৈসলামী বিধান মতে শাসিত হচ্ছে এবং কোটি কোটি মুসলমান অমুসলিম দেশে বাস করছেন, সেখানে বিশেষ জামা'আতগুলির নিরন্তর দাওয়াত ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমেই 'দ্বীন' জনগণের মাঝে টিকে আছে বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ জামা'আতের 'আমীর' শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন না। কিন্তু তিনি অবশ্যই শারঈ অনুশাসন কায়েম করবেন এবং স্বীয় মামূরকে সর্বদা দ্বীনের পথে ধরে রাখতে প্রচেষ্টা চালাবেন।

সংগঠন বিরোধীরা যুক্তি দেখান যে, সংগঠন করলে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অথচ এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। হিংসা-বিদ্বেষ সর্বত্রই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। তা সংগঠনে হোক আর ব্যক্তি বিশেষে হোক। তাইতো লেখক আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেকের জিজ্ঞাসা, وَهَلْ مَاتَ الْبُخَارِىُّ رَحِمَهُ اللهُ إِلاَّ مَحْسُوْدًا مَطْرُوْدًا؟ 'ইমাম বুখারী (রহঃ) কি হিংসার শিকার ও স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রবাসে মৃত্যুবরণ করেননি'?

সম্মানিত লেখক যুগের চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী সংগঠন বিষয়ে সৃষ্ট ধূম্রজাল দূরীকরণার্থে কুরআন ও হাদীছের আলোকে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিখে সমাজের যে খেদমত করেছেন, মহান আল্লাহ যেন তার জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন!

জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে সংগঠন করা যাবে না মর্মে সমাজে সৃষ্ট ফিৎনা দূরীভূত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর লেখক ও অনুবাদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক ১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মিসরের মানূফিয়া যেলার ‘আরাব আর-রম্ল’ (عرب الرمل) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়েমেনের আলে যুহায়ের গোত্রে তাঁর বংশের শেকড় প্রোথিত। পরবর্তীতে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইয়েমেন থেকে মিসরে হিজরত করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক জন্মসূত্রে মিসরীয় হ’লেও ১৯৬৫ সাল থেকে কুয়েতে বসবাস করে আসছেন। ২০১১ সালের ৩১শে অক্টোবর এক সরকারী নির্দেশে তাঁকে কুয়েতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। সালাফী পরিবারেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

نشأت-يوم نشأت-وفتحت عيني على العقيدة السلفية والدعوة السلفية، فإن أبي رحمه الله كان سلفي المعتقد-

‘আমি জন্মলগ্ন থেকেই সালাফী আক্বীদা ও সালাফী দাওয়াতের উপরে গড়ে উঠেছি। কেননা আমার পিতা সালাফী আক্বীদার মানুষ ছিলেন’ *(ছাফাহাত মিন হায়াতিন দাঈয়াহ, পৃ. ২৩)*।

শিক্ষাজীবন : তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী‘আহ অনুষদ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী (العالمية) লাভ করেন। এখানে তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খ আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (রহঃ), শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব বান্না, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ এবং শায়খ আব্দুর রহমান আদ-দাওসিরী (রহঃ) অন্যতম।

কর্মজীবন : তিনি ১৯৬৫-১৯৯০ সাল পর্যন্ত কুয়েতের বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। কুয়েতের সালাফী সংস্থা ‘জমঈয়াতু ইহ্ইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী’-তে তিনি গবেষক হিসাবেও কর্মরত ছিলেন।

লেখনী : তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ যাবত তার ৬১টি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আল-উছূলুল ইলমিইয়াহ লিদ-দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ। 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' শিরোনামে অত্র পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর (অবঃ) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। যা ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০১৬ সালে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। এছাড়া আর-রাদ্দু আলা মান আনকারা তাওহীদাল আসমা ওয়াছ-ছিফাত, আত-তরীকু ইলা তারশীদি হারাকাতিল বা'ছিল ইসলামী, ফুছূল মিনাস সিয়াসাতিশ শারঈইয়াহ ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ, আছারুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল-মাওযূ'আহ ফিল আক্বীদাহ, মাশরূইয়াতুল আমাল আল-জামাঈ, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ওয়াল-আমালুল জামাঈ, উছূলুল আমালিল জামাঈ, আস-সালাফিইয়ূনা ওয়াল আইম্মাহ আল-আরবা'আহ রাযিআল্লাহু আনহুম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বিশ্বে যে ক'জন সালাফী বিদ্বান স্বীয় ইলমের কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তন্মধ্যে শায়খ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক অন্যতম। সাবলীল ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থগুলি বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আক্বীদা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জামা'আত-সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহ মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই মহামানবের উপর, যিনি বিশ্ববাসীর জন্য করুণা ও পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত, যিনি আদম (আঃ)-এর বংশধরদের নেতৃপদে বরিত এবং সৌভাগ্যবানদের নেতা হিসাবে স্বীকৃত। আরও করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর পথের পথিকদের উপর।

আমাদের কিছু ভাই যারা কি-না কেউ শিক্ষার্থী, কেউ বিদ্বান, আবার কেউ বিদ্বান নন কিন্তু বিদ্বান হওয়ার দাবীদার, তারা বলে বেড়ান যে, জিহাদ শুধুই মুসলমানদের সার্বজনীন শাসকের অধীনে বৈধ। কোন জামা'আত বা দলের ছায়াতলে জিহাদ করা বৈধ নয়। আর ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত প্রত্যেকটি জামা'আত বা দল চাই তা জিহাদের নামে গঠিত হোক অথবা ইসলাম প্রচারের জন্য গঠিত হোক কিংবা সমাজ কল্যাণের নামে হোক কোনটাই শরী'আতসম্মত জামা'আত বা দল নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জুড়ে ইসলাম প্রচারের নামে যত জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- যেমন সালাফী জামা'আত, তাবলীগ জামাত, আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন ইত্যাদি সবগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদী জামা'আত বা দল। এগুলো গঠন করাও যেমন জায়েয নয়, তেমনি এদের সাথে কাজ করাও বৈধ নয়। তাদের এসব কথা আমি নিজ কানে খুব মনোযোগের সাথে শুনেছি।

এদের কারো কারো টেপরেকর্ড থেকে আমি নিজ কানে এ কথাও শুনেছি যে, এসব জামা'আত বা দল মু'তাযিলা ও খারেজী নামক বাতিল ফিরক্বাগুলোর নতুন সংস্করণ। কেননা এরাও দল খাড়া করে মুসলিম শাসক ও মুসলিম জামা'আতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

তারা এটাও দাবী করছে যে, আল্লাহ্র পথে দাওয়াতদাতা এসব জামা'আত বা দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে নেই; তারা বরং তা থেকে বিচ্যুত।

আমি যখন দেখলাম যে, অনেক মুসলিম তরুণ ও যুবক জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির সাথে সম্পর্কহীন এসব বাতিল ফৎওয়া ও অলীক কথায় বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছে তখন আমার মনে হল, সত্যকে না লুকিয়ে মানুষের সামনে তা তুলে ধরব। আল্লাহ তা‘আলা তো মানুষের কাঁধে সত্য না লুকিয়ে তা প্রকাশেরই দায়িত্ব দিয়েছেন। আর সেজন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এর ফলে আল্লাহ চাহে তো সত্য উন্মোচিত হবে এবং সত্যের উপর জমে থাকা মেঘ কেটে যাবে। মানুষ আল্লাহ্‌র সহায়তায় ছিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সোজা পথের সন্ধান পাবে।

আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমার দো‘আ ও নিবেদন তিনি যেন আমার প্রয়াসকে আন্তরিকতাপূর্ণ, নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত করে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১ম অধ্যায়

জামা‘আত-এর অর্থ[১]

কিছু মানুষের যে কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে জামা‘আত বা দল বলে (اَلْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى اَمْرٍ مَّا) ।

কমপক্ষে দু’জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠিত হ’তে পারে। এটাই সঠিক কথা। নবী করীম (ছাঃ) একাকী ফরয ছালাত আদায়কারী সম্পর্কে বলেছিলেন, مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ‘কে আছে, যে এর সঙ্গে ছালাত আদায় করে একে ছাদাক্বা করবে’?[২]

এখানে ছাদাক্বা বা দান অর্থ লোকটির সঙ্গে ছালাতে যোগ দিয়ে তাকে জামা‘আতে ছালাতের ছওয়াব লাভের সুযোগ করে দেওয়া। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِينَ دَرَجَةً ‘জামা‘আতে ছালাত আদায়ে একাকী ছালাতের তুলনায় ২৭গুণ বেশী ছওয়াব হয়’।[৩] সুতরাং উক্ত হাদীছ থেকে দু’জনে জামা‘আত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও স্রেফ একজনকে নিয়ে জামা‘আতে ছালাত আদায় করেছেন। অতএব কথা (قَوْلِيْ) ও কাজ (فِعْلِيْ) উভয় প্রকার হাদীছ দ্বারা দু’জন সদস্যের সমন্বয়ে দল গঠনের প্রমাণ মিলছে।

---

১. ‘আল-মু‘জামুল ওয়াসীত’ অভিধানে জামা‘আত বা দলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, اَلْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى هَدَفٍ تَحْتَ إِمَارَةٍ ‘একজন নেতার নেতৃত্বে কোন লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প নিয়ে জনগণের একতাবদ্ধ হওয়াকে জামা‘আত বা দল বলে’। মূলতঃ দল বলতে এমন কিছু মানুষের সমষ্টিকে বুঝায় যাদের একজন নেতা এবং কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। ঐ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচী থাকে। তারা সংঘবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যায়।-অনুবাদক।

২. আহমাদ হা/১১৬৩১; দারেমী হা/১৪০৮; আবূদাঊদ হা/৫৭৪; বায়হাক্বী, মা‘রিফাতুস সুনান হা/৪৩৩৩; হাকিম হা/৭৫৮, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত।

৩. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৪৯।

দলের সদস্য সংখ্যার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত নেই। তা যেমন হাযার হাযার হ’তে পারে, তেমনি লাখ লাখও হ’তে পারে। সংখ্যা যাই হোক তারা সবাই মিলে একটি দল হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ ‘জামা‘আতের সাথে আল্লাহ্র হাত রয়েছে’।[৪]

মুসলিমদের দল বললে, তাদের ঐ সংঘকে বুঝাবে- যারা যে কোন যুগে একজন ইমাম বা নেতার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন নবী করীম (ছাঃ) ফিৎনা সংক্রান্ত এক দীর্ঘ হাদীছে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ‘তুমি মুসলিমদের দল এবং তাদের ইমাম বা নেতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে’।[৫]

এখানে ‘আঁকড়ে থাকা’ অর্থ তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও দ্বীন আঁকড়ে থাকা নয়- বরং আঁকড়ে থাকা অর্থ তাদের জিহাদ-সংগ্রাম, ফিক্বহ বা চিন্তা-চেতনা ও কর্মতৎপরতায় শামিল থাকা। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ‘সাবধান! যার উপর কাউকে শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর সে তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখে তখন সে যেন তার ঐ অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে। কিন্তু তার আনুগত্য থেকে নিজের হাত যেন গুটিয়ে না নেয়’।[৬] অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ‘যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের এমন কোন কাজ করতে দেখ যা তোমাদের পসন্দ নয় তখন তোমরা তাদের সেই কাজকে অপসন্দ করবে, কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নেবে না’।[৭] তিনি আরও বলেছেন, مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ

---

৪. তিরমিযী হা/২১৬৬, হাদীছ ছহীহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত।

৫. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭।

৬. মুসলিম হা/১৮৫৫।

৭. মুসলিম হা/১৮৫৫।

السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে তার আমীর বা শাসক থেকে অপসন্দনীয় কোন আচরণ পাবে সে যেন তাতে ছবর করে। কেননা যে কেউ তার শাসক থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যাবে এবং ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যাবে, সে জাহিলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করবে'।[৮]

এই সব ক'টি হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, দল আঁকড়ে ধরে থাকা অর্থ দলনেতা বা শাসকের অধীনে জিহাদে গমন, তার নিকট যাকাতের অর্থ জমাদান ইত্যাদি। যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দলনেতার উপর ন্যস্ত রয়েছে তা আবশ্যিকভাবে মেনে চলা।

মোট কথা, দুই বা তদূর্ধ্ব সংখ্যা মিলে দল হয় এবং যে দলই কোন কাজ করতে সংঘবদ্ধ হবে তার জন্য একজন মান্যগণ্য নেতা থাকা অপরিহার্য। ছালাতের জামা'আতে মুক্তাদীদের যেমন তাদের ইমামের অনুসরণ ফরয, ঠিক তেমনই সফরের দলে, জিহাদের দলে, সার্বিক দলে যিনি ইমাম বা নেতা থাকবেন তার অনুসরণ করা ফরয হবে। আর দ্বীনের হোক বা দুনিয়ার হোক যে কাজেই একদল মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হয় তখন নির্বাহী আদেশদাতা একজন নেতা না থাকলে এবং সে আদেশ দ্বিধাহীনচিত্তে মানা না হ'লে তা জামা'আত বা দল বলে গণ্য হ'তে পারে না।

---

৮. মুসলিম হা/১৮৪৯।

২য় অধ্যায়

শরী'আতের আলোকে জামা'আত গঠন এবং জামা'আতবদ্ধ হওয়ার বিধান

যে সকল কাজ জামা'আতবদ্ধ না হয়ে সম্পাদন করা যায় না তার জন্য জামা'আত বা দল গঠন করা ওয়াজিব।[৯] যেমন উছূলুল ফিক্বহ বা 'ফিক্বহের সূত্রাবলী' শাস্ত্রের একটি সুসাব্যস্ত সূত্র রয়েছে, مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 'কোন ওয়াজিব যা না হ'লে সম্পাদন করা যায় না তা করা ওয়াজিব'। সুতরাং যুদ্ধের জন্য দল গঠন করা ওয়াজিব। কেননা শত্রুকে পরাভূত এবং মুসলিমদের বিজয়ী করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে হ'লে একটি সুশৃঙ্খল দল, একজন আমীর ও একজন সেনাপতি ব্যতীত কস্মিনকালেও তা পরিপূর্ণ হ'তে পারবে না। আর মুসলিম উম্মাহও একজন শাসক বা নেতা ছাড়া সংঘবদ্ধ হবে না। সুতরাং একজন শাসক বা নেতা দাঁড় করানো উক্ত সূত্র মতেই ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে সমাজ থেকে যে যে অন্যায় জামা'আতবদ্ধতা ব্যতীত রোধ করা সম্ভব নয় সেই সেই অন্যায় রোধ ও দূর করার জন্য জামা'আত বা দল গঠন করা ওয়াজিব। একইভাবে দ্বীনের মধ্যে যত ফরযে কিফায়া আছে সেগুলো সম্পাদনের জন্য একজন ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব। যেমন জুম'আর ছালাতের ব্যবস্থা করা, জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, মসজিদ নির্মাণ, লাশের গোসল দান, কাফন পরানো, দাফন (সমাহিত) করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ঈমান ও ইসলাম প্রচার করা ইত্যাদি কাজ আল্লাহ তার বান্দাদের উপর ফরযে কিফায়া বা সামষ্টিকভাবে ফরয করেছেন। সুতরাং এসব কাজে একজন নেতার নেতৃত্বে

---

৯. এই পুস্তিকায় যেখানেই ওয়াজিব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই তা ফরয বা অবশ্য পালনীয় অর্থ বহন করে। ফিক্বহ শাস্ত্রে ফরয-এর স্থলে ওয়াজিব শব্দের ব্যবহার অহরহ লক্ষ করা যায়। যেমন হিদায়া গ্রন্থে আছে, اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ 'ছিয়াম দুই প্রকার : ওয়াজিব ও নফল'। এখানে ওয়াজিব ছিয়াম হ'ল রামাযানের ছিয়াম। আর রামাযানের ছিয়াম সবার মতেই ফরয। অতএব ফরয অর্থে ওয়াজিব শব্দের ব্যবহার একটি সুপ্রচলিত বিষয়।- অনুবাদক।

সংঘবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব হবে। সারকথা উক্ত সুসাব্যস্ত সূত্র 'যা না হ'লে কোন ওয়াজিব পূরণ করা সম্ভব হয় না তা করা ওয়াজিব'-এর ভিত্তিতে বলব, দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, মুসলিম জাতি ও ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের চক্রান্ত রুখে দেওয়া একজন শাসক বা নেতা ছাড়া হ'তে পারে না। এজন্য দ্বীনী বিধান অনুসারেই একজন শাসক বা নেতা নিয়োগ করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে মুসলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর ছাহাবীগণ আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে ঐক্যমতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করেছিলেন। তাঁকে নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পাদন, আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নতকরণ এবং কাফিরদের ক্ষমতা খর্ব করা।

তারপর মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এই ধারা মেনে শাসক নিয়োগ করে আসছে। আল্লাহ তা'আলাও কুরআন মাজীদে ইমাম নিয়োগ দানের কথা সরাসরি বলেছেন- إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

এখানে 'আমানত' হল বিচারিক ও প্রশাসনিক আমানত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি (ইমামের নিকট) বায়'আত ছাড়া মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করবে'।[১০]

সারকথা, একজন নির্বাহী ক্ষমতাধর সর্বজনমান্য ইমাম নিয়োগ দান মুসলমানদের উপর ফরয। তাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক শাসন পরিচালনাকারী একজন শাসক নিয়োগ ছাড়া একটি রাতও কাটানো জায়েয নেই। নচেৎ তারা সকলেই পাপী হবে।

---

১০. মুসলিম হা/১৮৫১।

দেখুন, এভাবে জামা‘আতদ্ধতা ও নেতার কথা ইসলামের প্রায় ক্ষেত্রেই রয়েছে। ছালাতের জন্য জামা‘আত কারো মতে ফরযে আইন, কারো মতে ফরযে কিফায়া। উভয় মতানুসারেই জামা‘আত একটা হ’তেই হবে- যাতে ছালাত প্রতিষ্ঠা পায়। নতুবা জামা‘আত ছাড় দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আর ছালাতের অস্তিত্ব থাকবে না। ইসলামের এ রুকনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। তাতে কিন্তু সবাইকে পাপের ভার বহন করতে হবে। আবার যুদ্ধ করা যে ওয়াজিব তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ যথাযথভাবে করতে চাইলে একজন শাসক, একজন সেনাপতি ও একটি দল লাগবে। এরা পরামর্শের ভিত্তিতে মতামত নিবে এবং একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে। সুতরাং জিহাদের জন্য একজন শাসক বা সেনাপতি নিয়োগ করা লাগবে। সেনাপতি ও শৃঙ্খলা ছাড়া যার যার মত বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। কেননা তা পরাজয় ও ধ্বংস ডেকে আনবে। এ কথা বুঝার জন্য মানুষের বেশী একটা যুক্তি-বুদ্ধি খরচের দরকার পড়ে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে হজ্জের জন্যও একজন ইমাম বা নেতা নিয়োগ দেওয়া হ’ত। লোকেরা ঐ ইমামের নির্দেশেই হজ্জের জন্য বের হ’তেন এবং তার নির্দেশেই ফিরে আসতেন।

যাকাতের মত ইবাদতও কোন ইমাম বা নেতার নিকট জমা দান এবং নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন না করলে শুদ্ধ হয় না। আল্লাহ বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ‘তুমি তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর’ *(তওবা ৯/১০৩)*।

এ আদেশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। খলীফাগণও প্রতিটি শহর-জনপদে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ দিতেন। তারা ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রেরণকালে বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِى أَمْوَالِهِمْ

تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ -

'তুমি আহলে কিতাব ইহূদী-খৃষ্টানদের কাছে যাচ্ছ। তোমার সর্বপ্রথম কাজ হবে, তাদেরকে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেওয়া। তারা তা মেনে নিলে তুমি তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তা'আলা দিনে-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যখন এতে সম্মত হবে তখন তুমি তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। অবশ্য তুমি লোকদের বাছাবাছা দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে'।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 'তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে' এবং فَإِذَا اَطَاعُوْا فَخُذْ مِنْهُمْ 'তারা যখন এতে সম্মত হবে তখন তুমি তাদের থেকে যাকাত নেবে'-এর প্রতি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করুন। এ কথা প্রমাণ করে যে, ইমাম বা শাসকই যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণ মুসলমানদের যে যেমন ইচ্ছে যাকাত বণ্টনের স্বাধীনতা দেননি। বরং এলাকা ভিত্তিক আমীর বা দায়িত্বশীলের নিকট যাকাত জমা করতে হবে। তারপর শরী'আত বর্ণিত ব্যয়ের খাত অনুযায়ী তা ব্যয় করতে হবে।

হজ্জও ছালাতের মতই যাকাতও দলবদ্ধতা ও ইমাম বা নেতা ছাড়া হয় না। একইভাবে ছিয়ামের জন্যও শাসক বা নেতা আবশ্যক। তিনি হিজরী মাসগুলোর শুরু ও শেষ নির্ধারণ করবেন। মুসলমানরা তার এই নির্ধারণ মেনে নিয়ে সবাই ছিয়াম শুরু ও শেষ করবে; কেউ ছিয়ামের শুরু ও ইতি টানতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ 'ছিয়াম সেদিন

১১. বুখারী হা/৭৩৭২; মুসলিম হা/১৯।

থেকে যেদিন তোমরা ছিয়াম শুরু করবে, ঈদুল ফিতর সেই দিনে যেদিন তোমরা ঈদুল ফিতর করবে, আর কুরবানী বা ঈদুল আযহা সেই দিনে যেদিন তোমরা কুরবানী করবে’।[১২]

উল্লিখিত সকল বর্ণনা থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, ইসলামের চারটি স্তম্ভ যা মহা ইবাদত বলে গণ্য তার কোনটাই দলবদ্ধতা, শাসক বা নেতা এবং বিধি মেনে পালন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। সুতরাং ছালাতের জামা‘আত বা দলে শরীক হওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তাতে শরীক না হয়ে একাকী ছালাত আদায় করবে তার ছালাত হবে না। আর যে শাসককে এড়িয়ে নিজের মত যাকাত দেবে তার যাকাত হবে না। আর যে জনগণের সাথে ছিয়াম না রেখে নিজের মত করে ছিয়াম শুরু ও শেষ করবে সে দলচ্যুত ও পাপী হবে। এমনিভাবে যে নিজের মত করে হজ্জের মানসে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে আরাফায় অবস্থানের একটা দিন ঠিক করে নিয়ে হজ্জ করবে তার হজ্জ হবে না। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, উল্লিখিত ইবাদতগুলোর জন্য জামা‘আত বা দল আবশ্যক।

জিহাদের জন্যও যে জামা‘আত বা দল গঠন আবশ্যিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কোন জিহাদই একজন আমীর বা শাসক এবং একজন সেনাপতি ছাড়া হয় না। আবার এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, জামা‘আত বা দল ইমাম বা শাসকের আনুগত্য ছাড়া চলতে পারে না। তাইতো আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْهُ، ‘মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তার সঙ্গে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাথী হয়, তখন তারা চলে যায় না তার কাছ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত’ *(নূর ২৪/৬২)*।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, কোন মুসলিম যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে উদাহরণস্বরূপ জিহাদের মত কোন জামা‘আতবদ্ধ কাজে থাকবে তখন তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণের পরেই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্থান ত্যাগ করার সুযোগ মিলবে। অনুমতি ছাড়া চুপিসারে

---

১২. তিরমিযী হা/৬৯৭, হাদীছ ছহীহ।

কেটে পড়লে তা আনুগত্যের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে। তাতে করে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি ডেকে আনা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، 'আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬২)*।

يَتَسَلَّلُوْنَ لِوَاذًا অর্থ 'তারা লুকিয়ে পড়ে'। তারা গাছ, দেয়াল কিংবা লুকানোযোগ্য কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা রাসূলের আদেশ লংঘন করবে আল্লাহ তাদের সাবধান করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিপদ অথবা জ্বালাময়ী শাস্তিতে পতিত হওয়ার ধমক দিয়েছেন। যদিও এখানে রাসূলের আদেশটা ছিল জিহাদ (আন্দোলন) মূলক কাজের বিষয়ে, তবুও সার্বিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সব আদেশই তাতে শামিল হবে। কেননা আয়াতের শিক্ষা শব্দের ব্যাপকতার সাথে যুক্ত; শুধু অবতরণের ঘটনার মধ্যে তা সীমিত নয় (اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ) অতএব এখানে امره বা আদেশ اَوَامِر বহুবচন বা আদেশ সমূহ অর্থে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর সকল আদেশই মানতে হবে। তবে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয় যেমন এখানে জিহাদ তা অবশ্যই ঐ আদেশের আওতাভুক্ত হবে। বরং তা প্রথম কাতারে থাকবে। কেননা তার প্রেক্ষিতেই তো আয়াত নাযিল হয়েছে।

সারকথা : ইসলাম একটি জামা'আত বা দল ভিত্তিক ব্যবস্থা (نظام جماعي)। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তা জামা'আত বা দলের উপর নির্ভরশীল। চাই তা সার্বিক জীবনাচারে হোক কিংবা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের মত রুকনের ক্ষেত্রে হোক। জিহাদ ও সফরের জন্যও যেমন জামা'আত বা দল আবশ্যক, তেমনি গ্রাম, শহর ও অঞ্চলের জন্যও জামা'আত বা দল আবশ্যক। খলীফাগণও প্রতিটি সেক্টরে আমীর বা শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। যেমন বাজারের আমীর, শিল্প কারখানার আমীর ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

শাসক বা নেতার দায়িত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে, দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজই যথার্থ ও পরিপূর্ণভাবে শুরু করতে এবং শেষ করতে চাইলে তাতে জামা'আত বা দল গঠন আবশ্যকীয় ফরয। আমরা এ কথাও জেনেছি যে, মুসলমানদের ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদির কোনটাই জামা'আত বা দল, শৃঙ্খলাবিধি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা ছাড়া হয় না। আমরা আরও জেনেছি যে, মুসলিম দেশগুলোতে কোন গ্রাম, শহর, অঞ্চল এমনকি কোন পেশা ও শিল্পও এমন থাকতে পারবে না যেখানে বিবাদ মীমাংসার জন্য একজন ক্ষমতাশালী নেতা থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর পরবর্তীকালে খলীফা ও ছাহাবীগণ এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা এ পথেরই পথিক ছিলেন।

এখন আমরা সর্বসাধারণের ইমাম বা রাষ্ট্র নায়কের সেসব দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করব, যা আল্লাহ তার উপর ওয়াজিব করেছেন। সেসব আসলে কী?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সর্ব সাধারণের ইমাম বা খলীফার উপর আল্লাহ তা'আলা অনেক গুরুদায়িত্ব আরোপ করেছেন। এসব দায়িত্বের মূল লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন। নিম্নে এমন কিছু দায়িত্ব তুলে ধরা হ'ল- (১) আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিধান জারি করা ও কার্যকর রাখা (২) আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার করা (৩) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা (৪) যাকাত আদায় ও বণ্টন করা (৫) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা (৬) আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, লেখনী ও অস্ত্রশস্ত্র সহ জিহাদ করা (৭) মুসলিম শিশুদের লালন-পালন, পরিচর্যা ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা (৮) অসহায় প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান করা (৯) মানুষের মাঝে সাম্য-ইনছাফ কায়েম করা (১০) বিদ্রোহী ও অন্যায়-অত্যাচারকারীদের প্রতিহত করা (১১) অত্যাচারিত ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায় করে দেওয়া (১২) জনগণের জীবন-জীবিকা ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা (১৩) ইনছাফ ও সমতার ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে অর্থ বণ্টন করা ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শাসনক্ষমতা একটি মহা গুরুদায়িত্ব এবং অনেক বড় ও কষ্টসাধ্য আমানত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমারত বা শাসনকার্য সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا ‘নিশ্চয়ই তা আমানত এবং নিশ্চয়ই তা ক্বিয়ামতের দিন অপমান ও আফসোসের কারণ হবে। তবে তার জন্য নয়, যে উহার হক বুঝে উহাকে গ্রহণ করবে এবং ঐ সম্পর্কিত তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে’।[১৩]

কিন্তু আফসোস! বর্তমানে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে লুটের মাল মনে করে। এর মাধ্যমে তারা জনগণের মাথার উপর সওয়ার হয় এবং তাদের জান-মাল ও ইযযত-আবরুর উপর ইচ্ছেমত খবরদারী করে। অথচ আল্লাহ্র মানদণ্ডে অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্র মানদণ্ডে রাষ্ট্রক্ষমতা হ’ল এক দায়ভার ও জনগণের খেদমত। এ এমন এক দায়ভার যে, শাসনকর্তাই মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী কষ্টের বোঝা বহনকারী। তার দায়িত্বই সবচেয়ে কঠিন। এ কারণেই এ উম্মতের সবচেয়ে নেককার লোকেরা নেতৃত্বের দায়িত্বকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন এবং তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন।

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে দেখুন! তিনি বলছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি একদিন কিংবা এক রাতের জন্যও খিলাফতের দায়িত্ব চাইনি।[১৪] ওমর (রাঃ) খিলাফতকে বড়ই উপেক্ষার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তা একান্ত দায়িত্ব হিসাবে পালন করেছিলেন এবং মৃত্যুকালে তার প্রতি নিরুৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে খলীফা বানানোর জন্য আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করলে তিনি বলেছিলেন, খাত্ত্বাব বংশের একজনের জন্যই খিলাফতের দায়িত্ব পালন যথেষ্ট। যদি এ দায়িত্ব মধুর হয় তাহ’লে তারা তো তার ভাগ পেয়েছে। আর যদি তা না হয় তাহ’লে তাদের জন্য ঐ একজনের দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট’।

---

১৩. মুসলিম হা/১৮২৫।

১৪. লেখক ছহীহুল বুখারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে বুখারীতে অনুরূপ কোন উদ্ধৃতির সন্ধান পাওয়া যায়নি।- অনুবাদক।

মোটকথা, ইসলামে শাসকের দায়িত্ব এক বিরাট ও মহা গুরুদায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ– 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

এ যুগের মানুষের দৃষ্টিতে শাসনক্ষমতা, রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় পদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইসলামে শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় পদের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। অধিকাংশ লোক এখন রাষ্ট্রক্ষমতাকে পার্থিব মহাসুযোগ, নেতাগিরি করা এবং সম্মানের ব্যাপার মনে করে। তারা ভাবে, এতে করে তাদের অবস্থান দৃঢ় হবে এবং ক্ষমতা সুসংহত হবে। তারা কখনো ভাবে না যে, এ দায়িত্বের জন্য একদিন তাকে আল্লাহ্র সামনে কৈফিয়ত দিতে হবে।

অবস্থাতো এতটাই নীচে নেমে গেছে যে, অনেক মুসলিম দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জাগতিক সুখ-সুবিধা লাভই এখন তাদের মুখ্য লক্ষ্য। দ্বীনী কল্যাণ-অকল্যাণ সংক্রান্ত কোন চিন্তা তাদের মাথায় নেই। জাগতিক চিন্তায় বিভোর একজন শাসক যদি সুশাসকও হয় তবুও সে একথাই ভাবে যে, সে শুধু মানুষের ইহজাগতিক দায়িত্বশীল। ইহজগতে তাদের জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করা, জীবিকার উপকরণ বণ্টন করা, আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, বৈধ-অবৈধ সকল কাজ ইচ্ছেমত করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদিই তার কাজ। সুশাসক নিজে সুশাসনের জন্য উল্লিখিত বা অনুরূপ যা যা ভাবে জনগণও সুশাসন বলতে তেমনটাই ভাবে। তারা একজন শাসকের কাছে ঐগুলিই প্রত্যাশা করে।

কিন্তু আজ এমন সুশাসকেরও বড় অভাব। বেশীর ভাগ ক্ষমতাসীনই দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে ধ্বংস করতে সদা তৎপর। তাদের কাছে দ্বীনের উল্লেখযোগ্য কোন গুরুত্বই নেই। দ্বীনের দিক দিয়ে না তারা ছালাত কায়েমের ব্যবস্থা করে, না সৎ কাজের আদেশ দেয়, না অসৎ কাজের

নিষেধ করে, না ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। আবার পার্থিব দিক দিয়েও তারা না জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ আনয়নে তৎপর হয়, না জনগণের জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা বিধান করে, না দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে আগুয়ান হয়। তাদের কেউ কেউ তো ইসলামের শত্রুদের থেকেও মুসলমানদের সঙ্গে বেশী নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করে।

মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য কী সে ব্যাপারে তারা বড়ই উদাসীন। সারা দেশ জুড়ে তারা অন্যায়-অবৈধ ও শরী'আত গর্হিত কাজের সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে। যেসব কাজে আল্লাহ্র পথে ইসলামের পথে চলতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় সেগুলো করাই আজ তাদের পেশা ও নেশা। তারা অনুশীলনকারী (Practicing) মুমিনদের পাকড়াও করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। যখন কোন যুবক নিয়মিত মসজিদ পানে যেতে পা বাড়ায় তখন তারা তাকে ভয় দেখায়, অত্যাচার করে, জেলখানায় পুরে রাখে- অথচ তার কোনই অপরাধ নেই। অপরাধ শুধু একটাই যে, সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ'। আবার যখন কোন তরুণী হিজাব পরে বের হয় তখন তারা তাকে বিদ্রুপবানে জর্জরিত করে, লাঞ্ছিত করে। এমনকি অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, শিক্ষা লাভ ও পথে ঘাটে স্বাধীনভাবে চলাচলের মত ন্যূনতম অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়।

সমাজে যত নিকৃষ্ট ও খারাপ শ্রেণীর লোক আছে এসব শাসক তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়। তাদেরকে তারা বড় বড় পদে আসীন করে। দেশকে নরক বানানোই হয় তাদের কাজ। তারা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়। নাগরিকদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা একেবারে তলানীতে নামিয়ে দেয়। সমাজের কল্যাণকামী সম্মানিত ব্যক্তিদের তারা তিরস্কৃত করে আর বদমাশ, যুলুমবায, ঘুষখোর ও চোর-ছ্যাচরদের করে পুরস্কৃত।

এইভাবে এসব শাসক আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদের বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধে লিপ্ত। তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের আল্লাহ্র পথে চলতে বাধা দেয় এবং ইসলামের মাঝে এ দোষ সে দোষ খুঁজে বের করতে তৎপরতা চালায়।

অনেক ইসলামী দেশে 'ধর্মীয় তৎপরতা রোধ' (شُعْبَةُ مُكَافَحَةِ النَّشَاطِ الدِّيْنِيِّ) নামক সংস্থা খুলে জনগণের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তাহ’লে দেখুন! কীভাবে মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ ও শক্তিকে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টিতে ব্যয় করা হচ্ছে। এভাবেই পাল্লা উল্টে গেছে, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ফলে যে শাসক, খলীফা বা রাষ্ট্রপতির আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে ছালাত কায়েম, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, দ্বীনের পাহারাদারী এবং মুসলমানদের হেফাযতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ছিল সেই তারাই এখন আল্লাহ্‌র শত্রু হয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ এবং মুসলমানদের অর্থকড়ি নিয়ে যুদ্ধ করছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা ও পুণ্য কাজে আগুয়ান হওয়ার সামর্থ্য কারো নেই।

৪র্থ অধ্যায়

ফরযে কিফায়া সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র আহ্বানে উম্মাহ্‌র সকল সদস্যই শামিল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অবগত হয়েছি যে, মুসলিম শাসকদের উপর অনেক বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সন্দেহ নেই যে, শাসক সহ তার মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টামণ্ডলী, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ শাসন নামক যে আমানতের দায়িত্ব পেয়েছেন তা রক্ষা করা তাদের উপর ওয়াজিব। এতেও সন্দেহ নেই যে, কোন মুসলিম শাসক তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে সেজন্য তিনি পাপী হবেন। তবে আপন কর্তব্যে অবহেলায় যে শাসকই শুধু পাপী হবেন তা নয়; বরং জনগণও তাদের কর্তব্য পালন না করলে সমভাবে পাপী হবে। কেননা সকলেই যদি ফরযে কিফায়া তরক করে তবে সকলেই পাপী হবে। সুতরাং যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালায় আর মুসলিম শাসক তা প্রতিরোধে এগিয়ে না আসে, তখন সকল মুসলমানের উপর তাদের জান-মাল-ইয্‌যত ও দ্বীন রক্ষার স্বার্থে ঐ শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ ও যুদ্ধ করা ফরয হয়ে দাঁড়াবে।

কোন মুসলিম শাসক যদি ছালাত আয়োজনে আগ্রহ না দেখায়, জনগণের জন্য ইমাম-মুওয়াযযিন নিয়োগ না দেয়, মসজিদ নির্মাণ না করে তখন যে যে গ্রাম, শহর ও অঞ্চলে এমনটা ঘটবে সেই সেই স্থানের মুসলিমদের

উপর শাসকের অবহেলিত ও উপেক্ষিত কাজগুলো বাস্তবায়ন করা ফরয হবে।

মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন-দাফন করা, কুরআন শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ইত্যাদি ফরয কাজও কোন রাষ্ট্রপ্রধান যদি বেকার ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তার ছেড়ে দেওয়ার দরুন জনগণ এগুলো পালন না করার কোন অজুহাত খাড়া করতে পারবে না। বরং তারা পরস্পরে সহযোগিতা করে এসব ফরয কাজ সম্পন্ন করবে। নতুবা তারা সকলেই দোষী ও পাপী হবে।

এসব কথার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব আয়াতে এবং নবী করীম (ছাঃ) যেসব হাদীছে এসব ফরয কাজের আদেশ দিয়েছেন তাতে তিনি এবং তার রাসূল (ছাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে তা বলেছেন; শাসক-শাসিতের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি। এসব ফরয সম্পাদনে আল্লাহ তা'আলা শাসকের অনুমতি গ্রহণের শর্তও আরোপ করেননি।

বরং কোন শাসক যদি এসব ফরযের কিছু কিছু অকার্যকর করে দেন তাহ'লে সেসব ক্ষেত্রে জনগণের জন্য তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। পাঠক বলুন, যদি কোন শাসক কিংবা বিচারক জনগণকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে নিষেধ করে এবং মসজিদগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয় তাহ'লে কি জনগণকে জুম'আর ছালাত আদায়ে অক্ষম ধরে নিতে হবে? নিঃসন্দেহে তাদেরকে অক্ষম ধরে নেওয়া হবে না। বরং তারা যদি ঐ শাসক ও বিচারকের কথা মান্য করে জুম'আ আদায় না করে তাহ'লে তারা পাপী হবে। কারণ,لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[১৫]

একই অবস্থা দাঁড়াবে, যদি শাসক জনগণকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে নিষেধ করেন কিংবা তার জন্য কোন ব্যবস্থা না নেন। তখন জনগণ ঐ ফরয পালন না করে বেকার বসে থাকায় আল্লাহ্র কাছে কোন ওযর পেশ করতে পারবে না। বরং তারা আল্লাহদ্রোহী ঐ

১৫. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; আহমাদ হা/৩৩৭১৭; তাবারানী হা/৩৮১; মুসনাদে তায়ালিসী হা/১১১; হাকেম হা/৫৮৭০।

যালেম শাসকের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেরাই সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তাদের জন্য ঐ শাসকের আনুগত্য করা হারাম হবে। কেননা এ সময় তার কথা মানলে আল্লাহ্র কথা অমান্য করা হবে। আর আল্লাহ্র কথা অমান্য করে সৃষ্টির কথা মান্য করার কোন সুযোগ নেই।

এমনিভাবে যখন মুসলমানদের ইয্যত-সম্পদ লুণ্ঠিত হবে, তাদের ইয্যত ও সম্পদের উপর শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে বসবে আর শাসক নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন তখন তিনি তাতে দোষী, নিষ্ঠুর ও গণবিরোধী হবেন বটে, কিন্তু জনগণের তাতে বসে থাকলে চলবে না; বরং তার আদেশ মানার তোয়াক্কা না করে তারা নিজেরাই বরং নিজেদের জান-মাল-ইয্যত রক্ষায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এক্ষেত্রে শাসকের অবাধ্য হওয়াই বরং ফরয হবে।

একইভাবে সরকার কিংবা বিচারক যদি কুরআন শিক্ষাদান, শারঈ বিদ্যার প্রসার ঘটানো এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের সুন্দর ও কল্যাণমুখী চেতনায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা না নেয় তখন জনগণ নিজেরাও এর ব্যবস্থা না নিলে আল্লাহ্র নিকট তারা পার পাবে না। তাদের উপরই তখন এসব কাজের রূপায়ন ফরয হয়ে দাঁড়াবে- যদিও তাতে বিদ্যমান শাসকের অবাধ্য হ'তে হয়। কেননা তার অবাধ্যতার মানেই তো এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাধ্যতা।

অতএব একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উম্মতের সকল সদস্যই শারঈ বিধানের আজ্ঞাধীন। সবাইকেই ফরযে আইন (ব্যক্তিগত ফরয)-এর মত ফরযে কিফায়া (সমষ্টিগত ফরয)ও সমানভাবে পালন করতে হবে। শাসনকর্তা এসব ফরয পালনে অবহেলা করলে জনগণের তাতে অব্যাহতি মেলার কোন সুযোগ নেই। বরং তারা যদি আল্লাহ্র বিধানের প্রতি নারায এহেন যালেম সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাকে কিছু না বলে চুপ করে থাকে তাহ'লে তারা দোষী সাব্যস্ত হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করবে। এদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ– 'আর (স্মরণ কর) যেদিন অনুসরণীয়গণ তাদের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং

তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে ও পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৬)*। তিনি আরও বলেছেন, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ

لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيْصٍ– 'সবাই আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হবেই। সেদিন দুর্বলেরা ক্ষমতাবানদের বলবে, আমরা (দুনিয়াতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছুমাত্র রেহাই দিতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের সুপথ দেখালে আমরাও তোমাদের সুপথ দেখাতাম। এখন আমরা দিশেহারা হই বা ধৈর্যধারণ করি সবই সমান। আমাদের এখন বাঁচার কোন পথ নেই' *(ইবরাহীম ১৪/২১)*।

এ ধরনের আয়াত আরও অনেক আছে। এসব আয়াতে ফুটে উঠেছে যে, দুনিয়াতে যেসব শাসক ও নেতা আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে এবং আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে তাদের যারা অনুসারী হয়ে দুনিয়ার জীবন কাটিয়ে যায় তারা ঐসব নেতার অনুসরণের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট মুক্তি পাবে না।

এত কথার পরও বিবেক-বুদ্ধিওয়ালা কেউ কি শরী‘আতের এমন বিধান দেখাতে পারবে যে, শাসনকর্তাগণ ফরযে কিফায়া ত্যাগ করলে সাধারণ জনগণের তা থেকে অব্যাহতি মিলবে? কিংবা তারা নিজেদের নিরূপায় মনে করে বেঁচে যাবে?

৫ম অধ্যায়

স্থান-কাল ভেদে বিধি-বিধানের পরিবর্তন

একটি বিষয় আছে, যা অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষিতজনেরা বুঝে উঠতে পারে না। তা হ'ল, স্থান ও কালভেদে বিধিবিধানের পরিবর্তন। সুতরাং অবস্থা অনুসারে বিধি-বিধান নির্ণয় করতে হবে। কোন সময় একটা বিধান ফরয হবে- আবার কোন সময় তা ফরয থাকবে না। অনুরূপ কোন স্থানে ফরয হবে তো অন্য স্থানে হবে না। উদাহরণ হিসাবে হিজরতের কথা বলা যায়। যে সময়ে যে স্থানে আল্লাহ্র বিধান পালন সম্ভব হবে না সে স্থান থেকে ঐ সময়ে মুসলমানদের জন্য হিজরত করা ফরয হবে। কিন্তু যে স্থানে এমন সমস্যা নেই সেখান থেকে হিজরত ফরয নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ 'মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে'।[১৬] মক্কা বিজয়ের আগে মক্কা থেকে হিজরত ফরয ছিল। কেননা সেখানে মুসলমানদের দমিয়ে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। তারা ইসলামের নিদর্শনমূলক আমলগুলো প্রকাশ্যে করতে পারত না। কাফেররা তাতে বাধা দিত। কিন্তু কাফেরদের এহেন বাধায় দ্বীনের বিধান পালন না করে বসে থাকাকে আল্লাহ তা'আলা মোটেও গ্রাহ্য করেননি। কেবল দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুদের ওযর তিনি গ্রাহ্য করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا-

'যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার পর বলে, তোমরা কিসে ছিলে (অর্থাৎ মুসলিম না মুশরিক?)। তারা বলবে,

---

১৬. বুখারী হা/১৮৩৪।

জনপদে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে? অতএব ওদের বাসস্থান হ'ল জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। অবশ্য পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় বের করতে পারে না এবং কোন পথও জানে না তারা ব্যতীত' *(নিসা ৪/৯৭-৯৮)*।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মক্কার মুসলিমরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অসহায় ছিল। তার প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا– 'আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ'তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও' *(নিসা ৪/৭৫)*।

সকল মুফাসসিরের ইজমা অনুযায়ী الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا দ্বারা এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের আগে সেখান থেকে মদীনায় হোক কিংবা অন্যত্র হোক হিজরত করা ফরয ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সেখান থেকে হিজরত মুবাহ কিংবা মাকরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখুন, কিভাবে সময়ের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন ঘটে। হিজরতের ফরযত্ব কিন্তু এখনও বাকী রয়েছে। তবে তা এক স্থানে আছে অন্য স্থানে নেই; এক সময়ে আছে অন্য সময়ে নেই। একই কথা আরও অনেক বিধানে প্রযোজ্য। যেমন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, শাসকের অনুমতি গ্রহণ করা বা না করা, শত্রুদেশে গমন করা না করা ইত্যাদি।

আফসোস! অনেক আলেম ও শিক্ষার্থী ফৎওয়া দেন আর ভাবেন, এ ফৎওয়া প্রতিটি যুগ, প্রতিটি স্থান এবং প্রতিটি গোত্র ও প্রজন্মের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন বিশেষত্ব কিংবা ব্যতিক্রমের ধার তারা ধারেন না। যেমন আমাদের আলোচ্য পুস্তিকার মুফতীদের প্রশ্নোত্তরে ঘটেছে।

এসব শিক্ষার্থীর অনেকেই মাশাআল্লাহ্ এমন দেশে বাস করেন যেখানে শারঈ বিধান কার্যকর রয়েছে। যেমন সে দেশে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ জারি আছে, ছালাত কায়েমের ব্যবস্থা আছে, শারঈ বিদ্যা শিক্ষণ-শিখনের ব্যবস্থা আছে, মৃতদের দাফন, মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি যা যা দ্বীন সংক্রান্ত শাসকের দায়িত্ব তার সবই বিদ্যমান রয়েছে।

ফলে তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় মুসলমানদের জন্য কি উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য কোন সংগঠন বা দল গঠন করা জায়েয আছে? তখন তারা ফৎওয়া দেন যে, শাসকের অনুমতি ছাড়া কোন সংগঠন বা দল গঠন জায়েয নেই। তারা ভুলে যান, কিংবা জানেনই না যে, এমন অনেক দেশ আছে যার শাসকেরা এসব বিধান পালন তাদের দেশে হারাম করে রেখেছে। জনগণ তা পালন করতে গেলে তারা বাধা সৃষ্টি করে। অনেক দেশের শাসক শারঈ বিধানাবলীর কানাকড়ি মূল্যও দেয় না।[১৭]

তাহ'লে কি এসব অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসকদের অধীন দেশে মুসলমানরা চুপ করে বসে থাকবে? তারা কি এসব ফরয পালন করবে না? মুসলিমরা কি ইসলামের ভূমিকে আল্লাহ্র শত্রুদের হাতে তাদের যা খুশি তাই করার জন্য ছেড়ে দেবে? (আমাদের) শাসকরা তো এসব শত্রুর জন্য তাদের দরজা খুলেই রেখেছে। যেমন আফগানিস্তানের বাদশাহ যহীর শাহ্ নাস্তিক কম্যুনিস্টদের জন্য তার দেশ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারা ইসলামী আফগানিস্তানকে নাস্তিক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলে। সেখানে কুফরী ও নাস্তিকতার আইন চালু করা হয়।

তাহ'লে কি মুসলমানরা চুপ করে বসে থাকবে? নাকি তাদের সাধ্যমত নিজেদের সন্তান-সন্ততি এবং জান-মাল-ইযযত রক্ষার চেষ্টা করবে? নাকি তারা রাষ্ট্র প্রধান, অনাগত মাহদী অথবা ঈসা মাসীহের জন্য অপেক্ষা করবে?

---

১৭. অনেক দেশের সরকার তাদের স্বার্থে যতটুকুতে আঘাত লাগে না ততটুকু ধর্ম-কর্ম করতে দেয়। অনেক দেশে যুবসমাজ যাতে দ্বীন বিমুখ হয় সেজন্য পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও প্রাচ্যের শিরক ও নাস্তিকতাপূর্ণ সংস্কৃতি চালু করে রেখেছে। ইসলাম পালন তাদের দৃষ্টিতে জামা'আতবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগত ব্যাপার। জামা'আতবদ্ধ হ'তে গেলেই তারা নির্যাতনের শিকার হয়। এসব দেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী বিধান কি হবে এটি একটি বড় জিজ্ঞাসা- অনুবাদক।

নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় তাদের উপর নিজেদের জান-মাল-ইযযত ও দ্বীন রক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ফরয হবে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তারা কাজ করবে। আল্লাহ বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ 'আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*।

আল্লাহ তা'আলা এ সাহায্য করে দেখিয়েছেন। তোমরা দেখ কীভাবে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য করেছেন ও তার বিধান ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং নিজেদের জীবন ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

আরও দেখুন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে উত্তর দিয়েছিলেন, যে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন লোক যদি আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তবে আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি তাকে বাধা দেবে। সে বলল, সে যদি বাধা না মানে? তিনি বললেন, তুমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সে বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। সে বলল, আর যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বললেন, তুমি জান্নাতে যাবে'।[১৮] দেখুন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন। তার উপর যে কোন অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করা ফরয। কোন শাসকের অনুমতি কিংবা কোন ক্ষমতাধরের দয়া-অনুগ্রহের অপেক্ষা তাকে করতে হবে না।

আবার এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, হানাদার কাফের বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যদি জামা'আত বা দল ও নেতা ছাড়া একাকী সম্ভব না হয় তাহ'লে সেখানে জামা'আত বা দল গঠন করা ওয়াজিব হবে। কেননা এ সূত্র তো আগেই বলা হয়েছে যে, যা না হলে কোন ওয়াজিব পালন সম্ভব হয় না তা করা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে শাসকরা যে যে ফরযে কিফায়া নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে সেগুলো সম্পর্কে নীরব থাকা এবং দেশ ও সমাজ থেকে সেগুলোকে উৎখাত হতে

১৮. মুসলিম হা/১৪০।

Contents

দেওয়া জায়েয হবে না। বরং সেজন্য জামা‘আতবদ্ধ হয়ে তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হওয়া ওয়াজিব হয়ে দাঁড়াবে।

এমনকি শাসক একজন মুসলিম হ’লেও যদি ফরযের সময় সংকীর্ণ এবং বস্তু দ্রুত লয়যোগ্য হয় তাহ’লে সেক্ষেত্রে তার অনুমতির অপেক্ষা করাও বৈধ হবে না। যেমন লাশ দাফন, জুম‘আ-জামা‘আত কায়েম, মসজিদ পাকা করা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

আবার কোন মুসলিম জনপদ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ’লে যে এলাকা আক্রান্ত হবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের উপরই প্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ওয়াজিব হবে। পরে শাসক ও অন্যান্যরা এসে তাদের সাহায্যে হাত মিলাবে। কিন্তু উক্ত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী জনপদকে ইসলামের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

অথচ কী আশ্চর্য! কিছু কিছু শিক্ষার্থী ফৎওয়া দিতে গিয়ে নিজেরাও ভুল করে এবং অন্যদেরও ভুলের শিকার বানায়। তারা বলে যে, না! না!! এসব ফরয পালনে জামা‘আত বা দল গঠন আদৌ জায়েয নয়। যেমনটা আমরা আগেও বলে এসেছি।

মূলতঃ তাদের এহেন ভুল ফৎওয়া দানের পেছনে রয়েছে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, অদূরদর্শিতা, চার পাশের মুসলমানদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বদেশের বৃত্তে আবদ্ধ থাকা, অন্য দেশের মানুষের জীবন যাত্রার খোঁজখবর না রাখা, মুসলমানদের দ্বীনের প্রতি অনুরাগী করে তোলার কলা-কৌশল অনুশীলনের অভাব; গৌরব, বিজয় ও ক্ষমতা অর্জনের পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা ইত্যাদি।

আবার ‘স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে বিধি-বিধান পাল্টে যায়’- এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ফৎওয়া না দেওয়াও তাদের এহেন ভুলের একটি বড় কারণ। যাহোক, তারা সকল কালে, সকল স্থানে এ ফৎওয়া সমভাবে প্রযোজ্য হবে মনে করে তা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তা তাদের দেশের জন্য উপযোগী হ’লেও অন্য অনেক দেশের জন্য উপযোগী নয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী বিশ্বে সংগঠন ও দলের উপকারিতা

যারা কোন ফরযে কিফায়া সম্পাদনের জন্য একতাবদ্ধ হওয়া এবং জামা'আত বা দল গঠন করা হারাম বলে ফৎওয়া দেন তারা যদি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও দলের কর্মতৎপরতার ব্যাপক উপকারিতা ও সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করতেন, প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হ'তেন, বিশাল বিশ্বের আনাচে-কানাচে কোথায় কী ঘটছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার পর্দা নিজেদের চোখের উপর থেকে সরাতে পারতেন এবং দৃষ্টি নাক বরাবর সীমাবদ্ধ না রেখে দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারতেন তাহ'লে কখনই তারা এমন বাতিল ফৎওয়া ও ভিত্তিহীন কথার দিকে পা বাড়াতেন না।

সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, জুম'আ-জামা'আত কায়েম, উত্তমভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন, সুন্নাত মুতাবেক সমবেতভাবে হজ্জ সম্পাদন, আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ, যালিমদের প্রতিরোধ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী কাফির ও যালিম রাষ্ট্রনায়কের মুখোমুখি দাঁড়ানো, দুর্বল মুসলমানদের উদ্ধার করা ইত্যাদি বহুবিধ ফরযে কিফায়ার জন্য জামা'আতের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু মুসলিমদের জন্য এসব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা কেবল তারাই অস্বীকার করতে পারে, যাদের গুণাবলী আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নচেৎ আমাদের যুগে এসব ইসলামী দল ও ইসলামী মিশনই আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান (দাওয়াত) ও ইসলাম প্রচারের কাজ করে চলেছে এবং অর্থ ব্যয়, লেখালেখি, তলোয়ার চালনা, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদ বা সংগ্রামের গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

এই যে, আফগান মুজাহিদরা বিশ্বের এক অতি বড় স্বৈরাচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করল, তাতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দলের কর্মতৎপরতার ফলেই। তারা ত্যাগ ও কুরবানীর নিয়তে দলবদ্ধ হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র রাহে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছিল বলেই

Contents

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত একটি পরাশক্তিকে পদানত করা সম্ভব হয়েছিল। এই মুজাহিদরা যা করেছে, তা একটি জামা'আত বা দল, একজন আমীর বা দলনেতা, একটি নিযাম বা নীতিমালা, একটি কর্মপরিকল্পনা, শারঈ ইমারত বা নেতৃত্ব এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় না নিয়ে করা কি আদৌ সম্ভব ছিল? এদের জন্য কি তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ফরয ছিল? সেই রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামই বা কোথায় যার জন্য তারা অপেক্ষা করত?

আমরা আজ যে বিশ্বে বাস করছি সেখানে আপনারা আমাকে কি এমন একজন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান দেখাতে পারবেন, যিনি এমন পদাধিকারী? আর ঐ পদাধিকারী রাষ্ট্রপ্রধান থেকে অনুমতি নিয়ে যে সকল মুসলিম দল এখন আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে- তারা যুদ্ধ শুরু করতে পারবে?

আমরা প্রত্যেকেই কি আমাদের সেই সকল তরুণের জন্য গৌরব বোধ করি না- যারা ইউরোপ আমেরিকার মত প্রতীচ্যের দেশ থেকে আমাদের মাঝে ফিরে আসে, যারা বস্তুবাদী শিক্ষার সাথে সাথে দ্বীনী বা শারঈ বিদ্যাও ব্যাপকভাবে লাভ করেছে। তারা বরং মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকেও বেশ কয়েকগুণ বেশী ধর্মীয় বিদ্যা অর্জন করে থাকে। শুধু তাই নয়; বরং তাদের চরিত্র ও বোধ-বুদ্ধিও আমাদের হাতে প্রতিপালিতদের থেকে অনেক উন্নত। আমরা কি এজন্যেও গৌরববোধ করতে পারি না যে, এসব তরুণ যেসব অমুসলিম দেশ থেকে এসেছে সেসব দেশে তারা অনেক ফিৎনা-ফাসাদ, আযাব-গযব ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও সত্যের পথে শুধু অবিচলই থাকেনি; বরং সত্যকে বিজয়ী করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

না জেনে-বুঝে এসব ফৎওয়াদাতাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, এসব যুবক কি ঐসব সুগঠিত সংগঠন সমূহের ফসল নয়, যাদের একজন নেতা, একজন পরিচালক, একটি নীতিমালা, একটি অর্থ সংস্থান এবং একটি অনুশীলিত সুসংহত কর্মসূচী আছে?

আপনারাই বলুন, এই যুবকরা যদি গোঁফখেজুরে সেজে থাকত, তারা যদি শুধু তাদের পাঠ্যপুস্তকে নিমগ্ন থাকত অথবা শুধুই ওয়ায-নছীহত শুনত, কিছুই না করত তাহলে কি এই বিপুলসংখ্যক আদম সন্তান ইসলামের

ছায়াতলে আসত? সর্বত্র কি ইসলামী সেন্টার স্থাপিত হ’ত? বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ তৈরী হ’ত? গির্জাসমূহ মসজিদে রূপান্তরিত হ’ত? দ্বীনী বিদ্যা ও ফিক্বহ চর্চার জন্য কি পাঠচক্র গড়ে উঠত?

এবার আসুন, আমরা ইসলামী বিশ্বের দিকে তাকাই। অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার তার মিডিয়াকে দ্বীনী পরিবেশ নষ্ট ও দ্বীনকে ধ্বংস করার কাজে লাগিয়ে রেখেছে। তারা চাইছে, জনগণ দ্বীন পালনে তৎপর না হোক। আপনাদের আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন, আপনাদের চারপাশের যে যুবকেরা রয়েছে তারা কি তাদের দ্বীন আঁকড়ে ধরে আছে? তাদের নবীর সুন্নাত দাঁতে কামড়ে পড়ে আছে? তারা কি অন্যায় ও বাতিলের মুকাবিলার জন্য কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে? এসব দেশে বরং ইসলামী দলগুলোই ইসলামের জন্য যা কিছু করছে।

আফসোস! শত আফসোস!! সরকারী যেসব ধর্মীয় সংস্থা রয়েছে তাদের অধিকাংশ থেকে এমন সব মানুষ তৈরী হচ্ছে যারা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস বদলে ফেলেছে এবং দ্বীনী চেতনা বিনষ্ট করে ফেলেছে। তারা যখন যেমন তখন তেমন সাজে সাজছে। তাদের অবস্থা ‘যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার’-এর মত। তারা প্রতিটি দলের সাথে ওঠা-বসা করে এবং তাদের আল্লাহ্‌র পথে থাকার সার্টিফিকেট দেয়- তা ঐ সব দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচী যাই হোক না কেন। তারা অন্যদের জাগতিক স্বার্থে নিজেদের দ্বীনের নিন্দা-মন্দ বা দুর্নাম করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ফলে সৃষ্টিকুলের মধ্যে এসব দরবারী আলেমদের থেকে খারাপ ও দুশ্চরিত্রের লোক আপনি আর দ্বিতীয় পাবেন না। যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনী বিষয় এসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের ধর্মের ধ্বজাধারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ’ত তাহ’লে দ্বীনের একটা রগও যিন্দা থাকত না এবং তার একটা প্রদীপও প্রজ্জ্বলিত থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যুগের পরিক্রমায় এমন সব বান্দা নির্বাচন করেন যারা তার দ্বীনের পতাকা সব সময় উড্ডীন রাখতে সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহ্‌র পথে চলতে তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করেন না।

আর এভাবে যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বীনের জন্য পসন্দ করছেন তারা মূলতঃ দ্বীনী প্রচেষ্টার ফসল। এই দ্বীনী মহতী কাজই তো জান-প্রাণ দিয়ে আঞ্জাম দিয়ে চলেছে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দাওয়াতী

সংগঠন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে এরাই হবে সেই আদর্শ কুরআনী প্রজন্মের প্রথম নমুনা- যাদের বিষয়ে অচিরেই আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখাবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 'আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*।

৭ম অধ্যায়

দাওয়াতী সংগঠন সমূহকে হারাম বলে ফৎওয়া দেওয়ার প্রকৃত কারণ

হয়তো কোন প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করতে পারেন যে, এমন সুস্পষ্ট ভুলের মাঝে ঐ ফৎওয়াদাতাদের পতিত হওয়ার কারণ কী?

উত্তরে বলব, বিষয়টি বুঝার জন্য খুব একটা যুক্তি-বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন পড়ে না। বরং স্বতঃসিদ্ধভাবেই তা বুঝা যায়। কেননা কুরআন-হাদীছে এমন কোন প্রত্যক্ষ বক্তব্য নেই, যাতে সংগঠন গড়া ও পরিচালনা করা হারাম বলা হয়েছে। বরং ইসলাম পুরোটাই জামা'আত বা দলভিত্তিক দ্বীন। এর মাথায় রয়েছেন একজন সর্বজনমান্য ইমাম বা সার্বিক শাসক (اَلْإِمَامُ الْعَامُّ)। সকল মুসলমান এই সার্বিক শাসকের নির্দেশ, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মুতাবেক তাদের কাজ করবে। তাদেরকে ছালাতের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্য জামা'আত, ইমামের আনুগত্য ও নিয়ম-শৃংখলা মানা ফরয। ফরয ছিয়ামও জামা'আতবদ্ধ বা দলগতভাবে সম্পাদিত হয়। দেশের সবার জন্য রামাযান কবে শুরু হবে এবং কবে শেষ হবে তা শাসকই নির্ধারণ করেন। তদনুযায়ী আম মুসলমানকে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে হয়। যাকাতও নিয়ম মাফিক হিসাব-নিকাশ করে শাসকের সামনে ধারাবাহিকভাবে জমা দিতে হয়।

আবার ফরয হজ্জেও একজন ইমাম বা পরিচালক আবশ্যক। তিনি হজ্জের তারিখ ঠিক করেন। তার নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাজীরা চলেন।

জিহাদ করতেও একজন নেতা ও একজন সেনাপতি লাগে। শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা ছাড়া জিহাদ হয় না।

জগতের বুকে না অতীতে না বর্তমানে এমন কোন জীবনব্যবস্থার কথা জানা যায়, যে তার তিনজন অনুসারীর জন্যও সফরকালে একজন আমীর বা দলনেতা নিয়োগ ফরয করেছে। কেবল ইসলামই তা করেছে। অনুরূপ কোন জায়গায় স্রেফ তিনজন লোকও বাস করলে ইসলাম সেখানেও একটি জামা'আত বা দল, একজন ইমাম বা নেতা, একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ নীতিমালা এবং আনুগত্যশীল অনুসারীবৃন্দ ঠিক করার বিধান দিয়েছে।

সারা পৃথিবীতে আমি এমন একটা দ্বীন-ধর্ম ও নিয়ম-নীতি পাইনি, যেখানে ইসলামের মত তার অনুসারীদের জামা'আতবদ্ধ হওয়ার আদেশ রয়েছে। তারপরও এসব মুফতী কীভাবে এমন ধরনের ফৎওয়া দেয়?

অথচ আজ তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, মুসলমানরা লাঞ্ছিত, তাদের দ্বীন ধ্বংসোন্মুখ, তাদের কুরআনী বিধান ভূলুণ্ঠিত, তাদের নবীর সুন্নাত সর্বত্র উপেক্ষিত, তাদের নারী, পুরুষ ও শিশুরা অসহায়, তাদের শত্রুরা চারিদিক থেকে তাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে অবশ্যই একজন ইমাম বা দলনেতার অধীনে একটি জামা'আত বা দল গড়ে তোলা, পরস্পরে পরামর্শ করা, একে অপরকে সহযোগিতা করা, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে অবিরাম কাজ করে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। পূর্বসূরীরা এজন্য উত্তরসূরীদের প্রস্তুত করবে এবং অবিরত কাজ চালিয়ে যাবে- যে পর্যন্ত না এই লাঞ্ছনাকর অবস্থা থেকে জাতি মুক্তি পায় এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অগ্রগতি সাধিত হয়।

কিন্তু আফসোস! বিষয় এতটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জামা'আত বা সংগঠনবিরোধী ফৎওয়া দেওয়া হচ্ছে। অথচ দ্বীন ইসলামে এমন কোন কথা নেই যাতে জামা'আত গঠন করতে নিষেধ করা হয়েছে; বরং জামা'আত গঠন করতেই ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলাম জামা'আত গঠন করতেই আদেশ দেয়; জামা'আত গঠনকেই ফরয বলে। বস্তুতঃ মুসলমানদের সমষ্টিগত কোন কাজই জামা'আত ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন না করলে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হ'তে পারে না। জামা'আত বা সংগঠন ও সুসংহত

Contents

কর্মনীতির অভাবে দেখুন আজ মুসলমানদের অবস্থা কত নাযুক। তাদের দ্বীন সংক্রান্ত আমল-ইবাদত এক রকম পরিত্যক্ত ও ধ্বংসোন্মুখ। সকল ফরযে কেফায়াই বলতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপরও আমরা এসব বাতিল ফৎওয়া ও মতাদর্শ এমন সব ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ হতে দেখি যাদেরকে আমরা ভাল মানুষ বলেই জানি এবং তারা কোন বিচ্যুতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার বলেও মনে করতে পারি না। হ’তে পারে তাদের এহেন বাতিল ফৎওয়ার পেছনে নীচের কারণগুলো রয়েছে।

(ক) দ্বীন প্রচারে অতি আগ্রহ :

দ্বীন প্রচারে অতীব আগ্রহ এসব ফৎওয়াদাতাকে এরূপ ফৎওয়া দিতে আগ্রহী করেছে। তারা দেখে যে, যারাই দ্বীনী দায়িত্ব পালনে জামা‘আত বা দলবদ্ধ হয় তারাই আল্লাহ্‌র শত্রু যালিম ক্ষমতাধরদের নানা অত্যাচার ও শাস্তি-সাজার মুখোমুখি হয়। ঐসব ক্ষমতাধর এতই জঘন্য, ডাকাত ও নেকড়ের মত হিংস্র যে, মুসলমানদের কোন রীতি-নীতিই তারা বরদাশত করতে রাযী নয়। এ কারণে এসব সরলমনা দাঈরা ভেবেছেন- একাকী দাওয়াত প্রদানই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। নিয়মনীতির নিগড় থেকে দূরে থেকে দাওয়াত দিলে অপেক্ষাকৃত বেশী বিপদমুক্ত থাকা যায় এবং তাতে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এবং ক্ষয়ক্ষতিও বেশী একটি পোহাতে হয় না।

আমি তাদের বলছি, বন্ধুরা, তোমরা পথ ভুল করে ফেলেছ এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতার দরুন এমন ফৎওয়া দিয়েছ। সততা ও দৃঢ়চিত্ততার ভিত্তিতে তোমরা ‘জামা‘আতবদ্ধতা হারাম’ হওয়ার ফৎওয়া দাওনি। বস্তুতঃ কাপুরুষদের হাতে দ্বীন কায়েম হয় না এবং দুর্বলমনাদের দ্বারা ‘ত্বাগূত’ (আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী শাসক)-কে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আর যে সকল ফরযের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি তা জামা‘আত বা দল ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যালেমদের মনস্তুষ্টির নিমিত্তে এসব ফরয পালনে নিশ্চেষ্ট বসে থাকা যারপরনাই অপরাধ।

আল্লাহ বলেন, وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ– ‘আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহ’লে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ

ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতঃপর তোমরা কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হবে না' *(হূদ ১১/১১৩)*।

(খ) জামা'আত গঠনের রীতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না বলে ধারণা করা :

'জামা'আত বা দল গঠন করে দ্বীনী কাজ করা এবং যুদ্ধ-জিহাদ করার দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না বলে তারা ধারণা করেন। তাই তারা জামা'আত বা দল গঠন করে ইসলাম প্রচার কিংবা জিহাদ করা হারাম বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল। আমরা ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যেসব উপমা-উদাহরণ পেশ করেছি, সেগুলি তাদের কথা ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাদের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি আছে তাদেরও বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

আফসোস! আমি একটি টেপরেকর্ডে শুনেছিলাম, তাতে ঐ মুফতীদের একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমাদের জন্য কি দরিদ্র-অভাবীদের সাহায্যের জন্য একটি জামা'আত বা সংঘ গড়ে তোলা জায়েয হবে? আমরা কি অর্থ জমা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করে তা থেকে দুস্থ, অভাবী, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ইত্যাদি লোকদের সাহায্য করতে পারব? ঐ মুফতী তার উত্তরে বলেছিলেন, 'না তা জায়েয নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এমন জামা'আত গঠনের রেওয়াজ ছিল না'।

ঐ মুফতী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অর্থতহবিল না থাকা এবং তাঁর কাছে আগত অর্থ তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন বলে ফৎওয়ায় যে তথ্য প্রদান করেছেন তাতে তিনি মিথ্যার বেসাতি করেছেন। আসলে এটা দ্বীন সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতা, সুন্নাহ, সীরাত ও ইতিহাস সম্পর্কে পুরোটাই মূর্খতা এবং মুসলিম উম্মাহ্র শিকড় ধরে টানাটানির শামিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অবশ্যই তাঁর 'বায়তুল মাল' বা অর্থ তহবিল ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন তার দায়িত্বশীল অফিসার। হ্যাঁ, কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগত ধন-সম্পদ তিনি তৎক্ষণাৎ ভাগ করে দিতেন, আবার কখনো নিজের তত্ত্বাবধানে বায়তুল মালে রেখে

দিতেন। আর তা দিয়ে তিনি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাতেন। যেমন প্রতিনিধি দলের জন্য খরচ, ঋণ পরিশোধ, সেনাদলের ব্যয়ভার বহন প্রভৃতি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ জমা করে রাখতেন না। কিন্তু মুসলমানদের সম্পদ বায়তুল মালে জমা থাকত এবং তা প্রয়োজন মাফিক বণ্টন করা হ'ত। একই পথ অবলম্বন করেছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তীকালের খলীফাগণ।

বায়তুল মাল বা ধনাগার না থাকলে তো জাতির কাজই চলতে পারে না। তাদের অবশ্যই একটি সমৃদ্ধ ধনাগার থাকবে যেখানে ধন-সম্পদ জমা থাকবে এবং প্রয়োজনের সময় তা থেকে বিলি-বণ্টন করা হবে। উম্মতের কল্যাণমূলক কাজেও তা থেকে ব্যয় করা হবে। আর মানুষের জামা'আতী বা দলগত প্রচেষ্টায় দরিদ্র-অভাবীদের সাহায্য করা, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করা, বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করা তো অতীব ভাল এবং ছওয়াবের কাজ। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে বহু কথা বলা আছে।

আমি যদি এই ফৎওয়া নিজ কানে না শুনতাম তাহ'লে অবশ্যই বলতাম, এরূপ অর্থতহবিল বানানো এবং এজন্য জামা'আত বা দল গঠন হারাম হওয়ার ফৎওয়া কোন বিবেকবান মানুষ দিতে পারে না। কিন্তু আমি জনৈক ব্যক্তির টেপরেকর্ড থেকে নিজ কানে এই ফৎওয়া শুনেছি। তার ধারণা তিনি একজন বড় আলেম। দলে দলে লোক তার কাছে বিদ্যা শিখতে আসে এবং বহু মানুষ তার কাছ থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে।[১৯]

এখন এই মুছীবত যদি উম্মতের উপর চেপে না বসত, এরা যদি এমন আজগুবী ফৎওয়া না দিতেন তাহ'লে আমি এজন্য কাগজ-কলম ধরতাম না, এসব কথা লিখতাম না এবং নিজেকে এমন কথা প্রমাণ করার কাজে লিপ্ত করতাম না যার সম্পর্কে একদিন আমার ভাবনা ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে দিন প্রমাণ করে দেখানোর মতই বাতুল কাজ। কিন্তু যখন মুসলিম জাতি একদল অন্ধের খপ্পরে পড়ে গেছে তখন আমরা কী করব? তারা নিজেদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে এবং জনগণকে ধারণা দিতে চেষ্টা করছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনো বাতিলের মুখোমুখি হ'তে হয়নি।

১৯. কাজেই এমন ফৎওয়া যে সমাজে হরহামেশা দেওয়া হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।-অনুবাদক।

Contents

তিনি কোন বিপদে পড়েননি। তিনি কোন জামা'আত বা দল গঠন করেননি। তিনি সব রকম দল-সংগঠন হারাম করে গেছেন। তিনি লোকদের কোন কিছুর ব্যবস্থা না নিতে এবং কোন কাজের পরিণাম চিন্তা না করতে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় না দিয়ে কেবলই অবিমৃষ্যকারী সেজে কাজ করতে বলে গেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই ওয়াজিব- একাই একটি জাতি গড়ে তোলা। তারা কোন জামা'আত বা সংগঠন আঁকড়ে ধরবে না এবং অন্যের মতের আনুগত্য করবে না। তারা বরং স্বৈরাচারী দুর্নীতিবাজ শাসকদের অধীনে জীবন যাপন করবে। তাদের ইচ্ছেমত ওরা চলবে; ভাল-মন্দ সবকিছুতেই তাদের আনুগত্য করবে। কোন কিছুতেই তাদের বিরোধিতা করবে না। নতুবা তারা মন খারাপ করবে। তাদের খারাপ কাজ দেখে নিষেধ করতে যাবে না এবং তাদের দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ে আলোচনা করবে না। মুসলমানরা যদি খারাপ কাজ নিষেধের জন্য কিংবা শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য কিংবা অভাবীদের সাহায্যের জন্য কিংবা যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কিংবা মসজিদ তৈরীর জন্য কোন জামা'আত বা দল গঠন করে, তাহ'লেই তারা বরং পাপী, গুনাহগার ও অপরাধী হবে। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও আদর্শ থেকে বেরিয়ে যাবে!

বলুন, আমরা যখন এসব মুফতীর পাল্লায় পড়ব তখন কী করব? এরা আবার লোকসমাজে আলেম, মুত্তাক্বী, নেককার ও ধার্মিক হিসাবে গণ্য?

সারকথা, এসব মুফতী যে ফৎওয়া দিয়েছেন তা দ্বীন ও দ্বীনদার সম্পর্কে তাদের অলীক ধারণা হেতু। অথবা ব্যবহারিক সুন্নাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে তারা অজ্ঞ কিংবা জীবন সম্পর্কে তাদের কোনই ধারণা নেই। হয়তো আমার এই ছোট্ট পুস্তিকায় তাদের সহ সকলের জন্য কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে।

(গ) জামা'আতে খাছ্ছাহ ও জামা'আতে 'আম্মাহ-এর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা :

জামা'আত বা সংগঠন হারাম ঘোষণার তৃতীয় কারণ, একটি নির্দিষ্ট ফরয আদায়ের জন্য গঠিত জামা'আত বা দল এবং সকল মুসলমান মিলে একটি 'আম বা সার্বিক জামা'আত গঠনের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নির্ণয়ে তাদের ব্যর্থতা।

কোন নির্দিষ্ট ফরয আদায়ের জন্য গঠিত জামা'আত বা দলকে বলা হয় জামা'আতে খাছছাহ বা বিশেষ দল। যেমন আল্লাহ্র পথে জিহাদ, যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন, শিক্ষাদান, মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ, অনাহারীদের খাদ্য দান, যেসব নিষিদ্ধ কাজ জামা'আতবদ্ধভাবে ছাড়া নির্মূল সম্ভব নয় সেসবের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ফরযের জন্য গঠিত জামা'আত হ'ল খাছ বা বিশেষ জামা'আত। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সকলে মিলে গঠিত জামা'আত বা দলকে বলা হয় সার্বিক জামা'আত। সার্বিক দলে কর্তৃত্বসম্পন্ন একজন নেতা বা শাসক থাকবেন। তার হাতে দেশের সকল অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আনুগত্যের বায়'আত নিবে। এরূপ দল একটা দেশে একটাই থাকবে।

সন্দেহ নেই যে, বিশেষ জামা'আত বা দল এবং সার্বিক দলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন- সার্বিক জামা'আত বা দলের জন্য যিনি আমীর বা দলনেতা হবেন তিনি হবেন প্রকাশ্য আমীর। সকল মুসলমানেরই তার হাতে বায়'আত করা এবং তার আনুগত্য করা ফরয। কিন্তু বিশেষ জামা'আত বা দলের যিনি আমীর বা দলনেতা হবেন তার নিকট সকল মুসলমানের বায়'আত হওয়া এবং তার আনুগত্য করা ফরয হবে না। বরং যার কাছে তার কাজকর্ম ভাল লাগবে, তার চালচলন ও প্রচার-প্রপাগাণ্ডার ধরণে সে রাযী খুশী হবে সে তার দলে শরীক হবে। আর যার পসন্দ হবে না এবং অন্য কোন দলকে সে তার থেকেও যোগ্য ও উত্তম দেখতে পাবে সে ঐ দলে যোগ দিবে। এমন করায় তার কোন দোষ হবে না।

দ্বিতীয় একটি পার্থক্য এই যে, সার্বিক দলের বিরোধিতা করা জায়েয নয়। সুতরাং যখন একজন আমীর বা নেতার বায়'আত হয়ে যাবে তখন অন্য আরেকজন আমীরকে দাঁড় করানো এবং তার পক্ষ নিয়ে প্রথম আমীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا 'যখন দু'জন খলীফার জন্য বায়'আত করা হবে তখন শেষের জনকে তোমরা হত্যা করবে'।[২০] তিনি আরও বলেছেন, مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ

২০. মুসলিম হা/১৮৫৩।

عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوْهُ 'যখন তোমরা একজন নেতার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হবে তখন যে এসে তোমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাবে এবং তোমাদের জামা'আতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইবে, তখন তোমরা তাকে হত্যা করবে'।[২১]

তৃতীয় পার্থক্য হ'ল, সার্বিক দল একটাই থাকবে। কিন্তু বিশেষ দল একাধিক হওয়া জায়েয। বরং ওয়াজিব দায়িত্বের সংখ্যা যত হবে দলের সংখ্যাও তত হ'তে পারে। সীমান্ত ঘাঁটি পাহারা ও অন্যান্য ফরযে কিফায়াহ পালনে যত জামা'আত বা দল প্রয়োজন তত জামা'আত বা দল করা যাবে। সুতরাং কোথায় সার্বিক জামা'আত বা দল আর কোথায় বিশেষ জামা'আত বা দল! উভয়ের মধ্যে কত বড় ফারাক!

যাদের সামনে এসব ফারাক অস্পষ্ট থেকে গেছে এবং যারা এক থেকে অন্য দলের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না তারা ধারণা করে যে, যে সকল ফরয অকার্যকর বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেগুলো আবার কার্যকর বা সক্রিয় করার জন্য যারা জামা'আত বা দল গঠন করছে, জামা'আত বা দলের একজন আমীর বা নেতা নিয়োগ করছে এবং জামা'আত বা দল পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্র বানাচ্ছে তারা সবাই বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধাচারী এবং মুসলিমদের দলে বিভক্তি সৃষ্টিকারী। সুতরাং যারাই নিজেদের মাঝে জামা'আত বা দল গঠন করে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করছে, অজ্ঞদের শিক্ষাদান, শিক্ষার প্রসার ঘটানো ইত্যাদি কাজ করছে তাদের মতে তারা সবাই উক্ত দোষে দোষী।

এটা মূলত বুঝার ভুল এবং বিশেষ জামা'আত ও সার্বিক জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার ফলে হয়েছে।

(ঘ) কিছু দলের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড :

এসব জামা'আত বা দলের কোন কোনটি কখনো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নেতিবাচক কিছু কর্মকাণ্ড করে থাকে। ফলে এসব মুফতী সেজন্যও জামা'আত গঠনকে হারাম বলে থাকেন। যেমন তারা অনেকে বিদ'আতে

---

২১. মুসলিম হা/১৮৫২।

ডুবে থাকে, অনেকে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, আবার অনেকে দলীয়-উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে তারা কেউ কেউ ফৎওয়া দেন যে, এসব দল-উপদল সার্বিক দলের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি ডেকে আনছে, এদের কারণে বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনেক সুন্নাহ পরিত্যক্ত হচ্ছে। এদের লাগাম টেনে না ধরলে অবস্থা আরও নীচে নেমে যাবে। কাজেই জামা'আত বা দল গঠন করা হারাম।

কিন্তু এ কথার মধ্যে বড় রকমের গলদ রয়ে গেছে। আমাদের শুধু নেতিবাচক ও ক্ষতিকর দিক দেখলেই হবে না, বরং ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকও দেখতে হবে। এদিকটায় অন্ধ থাকলে চলবে না। একজন সক্রিয় প্রচারক- যিনি আল্লাহ্র দিকে ডাকেন- তার কিছু কাজে ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে, এমনকি কিছু বিদ'আতও ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু তাই বলে আমরা তার সকল প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডকে বাতিল আখ্যা দিতে পারি না। মানব সমাজে এমন কেউ আছে কি যার কোন ভুল হয় না? হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তো এমন লোকদের ভাল-র সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ 'তারা এমন লোক হবে যারা আমার পথের বাইরে চলবে এবং আমার সুন্নাহ বা তরীকা ছাড়া ভিন্ন সুন্নাহ বা তরীকা অবলম্বন করবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে'।[২২] খুঁত থাকা সত্ত্বেও এ দলটি যখন ভাল গণ্য হচ্ছে তখন দল বিশেষের প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডে খুঁত থাকলেই তা বাতিল গণ্য করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না।

আর প্রচারভিত্তিক জামা'আত বা দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তো মূলনীতি অনুসারেই জায়েয। ভাল কাজে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজের প্রসার ঘটাতে পাল্লা দেওয়া এবং জয় করায়ত্ত করা শরী'আতসম্মত কাজ। এটি বরং মুস্তাহাব। নিষিদ্ধ প্রতিযোগিতা তাই যা অন্যায়ের জন্য করা হবে এবং ভাল কাজে যে জয়যুক্ত হবে তার প্রতি হিংসা তৈরী করবে। এ ক্ষেত্রে বরং প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি এগিয়ে

---

২২. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭।

থাকা ব্যক্তির জন্য দো'আ করবে এবং তার মত কিংবা তার থেকেও বেশী পরিমাণে ভাল কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। যেমন আওস ও খাযরাজ গোত্র প্রত্যেক ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করত। যেমন তাবুক যুদ্ধে ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য তাঁর অর্ধেক সম্পদ এনে হাযির করেছিলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) হাযির করেছিলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। ফলে ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا 'আমি কোনদিন কোন বিষয়ে আপনার আগে যেতে পারব না'।[২৩]

আর হিংসা-বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা তো দলে দলে যেমন হারাম, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও তেমনি হারাম। এটি শুধু দলের মধ্যে জন্ম নেয় তা নয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও জন্ম নেয়। এটাও সুবিদিত যে, লোকসমাজে শিক্ষিতরাই একে অপরের প্রতি বেশী হিংসাপরায়ণ। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ 'অথচ যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পরেও তারা পারস্পরিক হঠকারিতাবশে উক্ত কিতাবে মতভেদ করল' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

যদিও এ আয়াত পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নাযিল হয়েছিল তবুও আমাদের উম্মতও অনুরূপ মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এ বিষয়ে তারা তাদের থেকেও একধাপ এগিয়ে।

এজন্যই হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ একটি বড় মূলনীতি (أَصْلاً عَظِيْمًا) বানিয়েছেন যে, 'সমকালীন আলেমদের পারস্পরিক দোষারোপ (جَرْحٌ) গ্রহণযোগ্য নয়'। কেননা এ দোষারোপের অনেকটাই হিংসার বশবর্তী হয়ে করা হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তো তাঁর দেশের শাসকের হিংসার শিকার হয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং অন্যত্র ইন্তিকাল করেন। তাহলে আলেমরা পরস্পরে হিংসা করে বলে কি আমরা ইলম অর্জন হারাম করব এবং আলেমদের অস্তিত্ব বাতিল করে দেব। ধরুন কাতার বা মদীনায় একজন

---

২৩. দারেমী হা/১৭০১; আবুদাঊদ হা/১৬৭৮; বায়হাকী হা/৭৭৭৪,; হাকেম ও আবু নু'আইম এটিকে ছহীহ এবং আলবানী হাসান বলেছেন।

আলেম একাকী দাঁড়িয়ে গেলেন। এখন তার খাতিরে আমাদের উপর অন্য একজন আলেমের দাঁড়ানো হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা ওয়াজিব হবে কী? যেন তারা দু'জনে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'তে না পারে?

আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয় এবং তা জায়েযও নয়। একাধিক জামা'আত বা দলের অবস্থাও তদ্রুপ। একদল অন্য দলকে হিংসা-বিদ্বেষ করল বলে দ্বিতীয় দলকে হারাম ঘোষণা বৈধ হবে না। বরং প্রচার ও জিহাদ কেন্দ্রিক দল একাধিক হ'লে তাদের অকল্যাণের চাইতে কল্যাণই বেশী। কেননা তখন একদল আরেক দলের কাজের মূল্যায়ন করবে এবং নিজেদের কাজের গতি ও মান বাড়াতে সচেষ্ট হবে। তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল কাজ বেশী বেশী করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং কাজের মান বাড়বে।

পক্ষান্তরে বিভেদ সৃষ্টি হবে বলে সংগঠন হারাম হওয়ার কথা বলা অজ্ঞতাপ্রসূত একটি দুর্বল চিন্তা। যে কোন বিভাজনই যদি বিভেদের কারণ হয় এবং সেজন্য বিভাজন মাত্রেই বাতিল গণ্য হয় তাহলে আনছার-মুহাজির, আওস-খাযরাজ নামাঙ্কিতদেরও বাতিল গণ্য করতে হয়। আপনি কি জানেন না যে, মুহাজিরদের আলাদা পতাকা, পরিচিতি, প্রতীক ও বৈশিষ্ট্য ছিল? তদ্রুপ আনছারদেরও ছিল? জিহাদের ময়দানে উভয় দলের আলাদা পতাকা ও আলাদা সেনাপতি থাকত? এরূপ বিভাজন থাকার ফলে সময় সময় উভয় দলের মধ্যে হিংসা, শত্রুতা ও গোত্রপ্রীতিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠত? যেমন মুরাইসী' বা বনু মুছত্বালিকের যুদ্ধে ঘটেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে গোত্রপ্রীতি দেখাতে নিষেধ করেছিলেন। তবে গোত্রের নামে নামাঙ্কিত হ'তে নিষেধ করেননি; বরং পবিত্র কুরআনে ঐ দু'টি নামেই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য

প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা।’ *(তওবা ৯/১০০)*। তাই মুহাজিরগণ ‘মুহাজির’ নামে এবং আনছারগণ ‘আনছার’ নামেই থেকে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেককে স্ব স্ব দলের প্রতি অবৈধভাবে দলপ্রীতি দেখাতে নিষেধ করেছেন। তিনি দলীয় ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করেননি। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব গোত্রের নামের সৈনিক হ’লেও একই যুদ্ধের ময়দানে একই সেনাদলের হয়ে একক সেনাপতির অধীনে একই লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে যুদ্ধ করেছেন।

দলের সংখ্যাধিক্য মাশায়েখ বা জ্ঞানতাপস শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়। ঐ জ্ঞান তাপস শিক্ষকদের প্রত্যেকের জন্য কি নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষার্থী থাকা হারাম? যারা প্রত্যেকের থেকে আলাদা আলাদাভাবে ইলম শিখবে, তার তত্ত্বাবধানে ফিক্বহ শিখবে তারপর তার শেখানো ইলম ও ফিক্বহ প্রচার করবে? যদি তা নাজায়েয হয় তাহলে আমাদের উপর অবশ্যই উক্ত জ্ঞানতাপস শিক্ষকদের শিক্ষা মজলিসকে, মাযহাবের ধারক শিক্ষার্থীদেরকে এবং একজন নির্দিষ্ট ইমাম থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ফিক্বহ শিক্ষাকে বাতিল গণ্য করা ফরয হবে। যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও তা হারাম বলবে না। তাহলে এসব মুফতী বিভেদ ও দ্বন্দ্বের কথা তুলে কী করে দলের সংখ্যাধিক্যকে হারাম বলে ফৎওয়া দিতে পারেন?

আজকের দিনের ইসলাম প্রচারক দলগুলোর মধ্যকার বিভেদ বিগত দিনের জ্ঞানতাপস শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বিভেদের মতই। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানে যে, এসব জ্ঞানতাপস মাশায়েখের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দরুন পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে কী ধরনের হিংসা, খুনখারাবী, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে এনেছে। এসব কিছুই কিন্তু ঘটেছিল মাযহাবপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষের ফলে। তাই বলে কি আমরা ঐসব জ্ঞানতাপস শিক্ষক, তাদের শিক্ষার্থী এবং তাদের মাযহাবকে হারাম বলব? এগুলোও তো বিভেদ ও দ্বন্দ্ব উস্কে দেয়!

ইসলাম প্রচারক দলগুলোর অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে পুরোটাই জ্ঞানতাপস শিক্ষকবৃন্দ ও তাদের শিক্ষার্থীদের অনুরূপ, যা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রচার সংঘের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। এসব জামা‘আত

বা সংগঠনের মধ্যে মানগত তারতম্য, কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা, অঙ্গীভূতকরণ ক্ষমতা, বিশেষায়ণ ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এসব পার্থক্য গ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ, জামা‘আত বা দলগুলোতে কখনো বিচ্যুতি, কখনো বিদ‘আত, কখনো ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু এর কোনটাই আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতদাতা দলগুলোকে হারাম বলার উপযুক্ত কোন কারণ নয়। এই দলগুলোই তো ইসলামী হুকূমতের চৌহদ্দী পাহারা দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ফরযে কিফায়াহ সম্পাদন করে চলেছে, যা কি-না ছিল সকল উম্মতের উপর ফরয।

এখন আমি আশা করতে পারি যে, চক্ষুষ্মানের সামনে আঁধার কেটে ভোর পরিষ্কার হয়েছে এবং সঠিক রাস্তা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট বুঝা গেছে যে, ইসলাম প্রচারকারী দলগুলোকে হারাম আখ্যাদানকারী বক্তা মাত্রাজ্ঞান ছেড়ে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ফৎওয়া দিয়েছেন। তারা তাদের ফৎওয়ার মাধ্যমে এমন সব কাজ হারাম গণ্য করেছেন, যা আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের উপর ফরয করেছেন। সত্যের পথে চলতে একে অপরকে জোরালোভাবে ডাকা, পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া, সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরে সহযোগিতা করা, আল্লাহ্‌র রজ্জু কুরআন ও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মযবুতভাবে ধারণ করা, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হওয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানকারী একটি উম্মাহ বা জাতি হওয়াটা আসলেই ফরয।

****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–